সূচিপত্র

আলোচ্য বইয়ের উপর লেখিকার সাক্ষাৎকার.....১১

ভূমিকা ২০

পর্ব এক
শিশুর ঈমান পরিচর্যার ভিত্তি

অধ্যায় এক : আকীদা, ঈমান এবং ইহসান.....২৬
আকীদা শব্দের অর্থ.....২৬
ইসলামি আকীদার গুরুত্ব.....২৭
আকীদা এবং ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্ক.....২৮
ঈমান এবং মুমিন-এর অর্থ.....২৮
অন্তরে বিশ্বাস ৩১
মুখে স্বীকৃতি প্রদান.....৩১
আমলে বাস্তবায়ন.....৩২
ইহসান এর অর্থ.....৩২
সন্তান প্রতিপালনের সাথে ঈমান, আকীদা, ইহসানের সম্পর্ক কী? ৩৩

অধ্যায় দুই : সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বশীলতা অনুধাবন ৩৭
দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা.....৩৮
সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা.....৩৯
সন্তান প্রতিপালনের পুরস্কার ও আনন্দ.....৪২
সন্তান প্রতিপালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ.....৪৩
লুকমান হাকীম-এর ঘটনা.....৪৩

অধ্যায় তিন : সন্তান প্রতিপালনের বুনিয়াদি বিষয়সমূহ.....৪৮
বৈবাহিক সম্পর্কের গুরুত্ব.....৪৮
বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াদি.....৪৯

বিয়ে এবং সন্তান প্রতিপালন ৫১
নারী-পুরুষের সুনির্দিষ্ট ও পৃথক ভূমিকাসমূহ পালন করা ৫১
মাতৃত্বের সুমহান ভূমিকা ৫৩
নারীর কর্মক্ষেত্র ৫৪
পিতৃত্বের ভূমিকা ৫৫
নিজের ঈমান বিকশিত করা ৫৬
সন্তানের মৌলিক অধিকার (পিতা-মাতার দায়িত্ব) ৫৭
পিতা-মাতার মৌলিক অধিকার (সন্তানের দায়িত্ব) ৫৮
শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর গুরুত্ব, শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক ও প্রথম অনুরাগ . ৫৯
শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক ও প্রথম অনুরাগ ৬০
নেক সন্তানের জন্য দুআ করা ৬১

অধ্যায় চার : ইলম ও শিক্ষালাভ ৬৩
ইলমের গুরুত্ব ৬৩
ইলম-এর অর্থ কী? ৬৫
ইলম এবং পিতা-মাতার ভূমিকা ৬৬
ইলম এবং সন্তান প্রতিপালন ৬৭
ইলম অর্জনের থেকেও বেশি কিছু ৬৮
আরবি ভাষা শিক্ষা করা ৬৯
রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদান ৭১
দৃশ্যমান উপমা প্রদান করা ৭২
ঘটনা বর্ণনা করা ৭২
কসম করা ৭৩
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ধীরে ধীরে শিখানো ৭৩
বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা ৭৩
মানুষের সহজাত প্রকৃতির দিকে মনোযোগ প্রদান করা ৭৪

অধ্যায় পাঁচ : ফিতরাত—শিশুদের সহজাত প্রকৃতি ৭৫
ফিতরাত কী? ৭৬
তাওহীদের চুক্তি স্বাক্ষরিত আছে প্রতিটি মানব-প্রাণে ৭৬
শিশুমনে পিতা-মাতার প্রভাব ৭৭
শিশুমনে শয়তানের প্রভাব ৭৯
শিশুর ফিতরাত (সহজাত প্রকৃতি) রক্ষায় পিতা-মাতার দায়িত্ব ৭৯

পর্ব দুই
ঈমানের রুকনসমূহের সাথে শিশুকে সংযুক্ত করা

অধ্যায় ছয় : আল্লাহ—যিনি উচ্চ, যিনি শক্তিমান.....৮২
আল্লাহর উপর ঈমান ৮২
আল্লাহর সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন..... ৮৫
শিশুকে আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব শেখান..... ৮৯
শিশুকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখান.....৯১

অধ্যায় সাত : ফেরেশতাদের কথা ৯৫
ফেরেশতাদের উপর ঈমান ৯৫
ফেরেশতাদের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন..... ৯৭

অধ্যায় আট : নবি-রাসূলদের কথা.....১০৮
নবি-রাসূলদের উপর ঈমান ১০৮
নবি-রাসূলদের সাথে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিন.....১১২

অধ্যায় নয় : আসমানি কিতাব এবং ওহি.....১১৭
আসমানি কিতাব এবং ওহির উপর ঈমান.....১১৭
ওহির সাথে শিশুদের সংযুক্ত করা..... ১২১

অধ্যায় দশ : বিচার-দিবস এবং আখিরাতের জীবন ১২৬
বিচার-দিবস এবং আখিরাতের উপর ঈমান.....১২৬
বিচার-দিবস এবং আখিরাতের সাথে শিশুদের সংযুক্ত করা ১৩১
মৃত্যুর বাস্তবতা থেকে শিশুকে আখিরাতের শিক্ষা দেওয়া ১৩৪
দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা.....১৩৬
দুনিয়ার বাস্তবতা ১৩৮

অধ্যায় এগারো : তাকদীর ১৪১
তাকদীরের উপর ঈমান..... ১৪১
শিশুদেরকে তাকদীরের ইলম দান করা ১৪৪
তাকদীরের উপর ঈমানের কিছু উপকারিতা.....১৪৯

পর্ব তিন
শিশুর মনে ইসলামি ব্যক্তিত্ববোধ তৈরি করা

অধ্যায় বারো : ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিকাশের কিছু সূত্র ১৫১
ব্যক্তিত্ব (Personality) ১৫১
পরিচিতি (Identity) ১৫১
শুরু থেকে শুরু করুন! ১৫১
শিশু যেন সবকিছু ইসলামের চোখে দেখতে শিখে ১৫৪
শিশুকে আনুগত্যের গুরুত্ব শেখাতে হবে ১৫৫
পরিবারের মধ্যে আনুগত্যের চর্চা ১৫৬
শিশুমনে নৈতিকতার বিকাশ ও প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি ১৫৮
শিশুদেরকে উত্তম মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা-প্রদান করা ১৫৯
শিশুর জন্য পিতা-মাতাকেই উত্তম আদর্শ হতে হবে ১৬১
মুসলিম হওয়া গর্ব ও সম্মানের বিষয় ১৬১
জিহাদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি ১৬২
শিশুদেরকে ইসলামের বীরযোদ্ধা, জিহাদ ও বিজয়ের গল্প বলুন ১৬৫
নৃতাত্ত্বিক ও জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের পূর্বে ইসলাম ১৬৫

অধ্যায় তেরো : শিশুমনে ইসলামি ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদা সৃষ্টি ১৬৭
সংজ্ঞা : আত্ম-সচেতনতা (self-concept) ও আত্মমর্যাদা ১৬৭
আত্মমর্যাদার গুরুত্ব ১৬৭
আত্মমর্যাদাবোধ তৈরির কিছু উপায় ১৬৮
আল্লাহ-প্রদত্ত উপহারগুলোর পরিচর্যা করুন ১৬৮
আপনার শিশুকে ভালোবাসুন ১৬৮
আপনার শিশুকে সঙ্গ দিন ১৭০
শিশুর উত্তম আচরণের প্রশংসা করুন ১৭১
প্রকাশ্যে শিশুর প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদান ১৭১
শিশুকে অপমান করবেন না, লজ্জা দিবেন না ১৭২
শিশুদের সাথে পরামর্শ করুন এবং তাদের মতামত জানুন ১৭৩
দায়িত্বশীলতার বিকাশ ও স্বাধীনতা প্রদান ১৭৪

পর্ব চার

পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হওয়া

অধ্যায় চৌদ্দো : ঘরের পরিবেশ—আগে ঘর, তবে তো পর ১৭৬
বাড়িতে ঈমানি পরিবেশ তৈরি করুন ১৭৬
বড়িতে সালাত প্রতিষ্ঠা করুন ১৭৭
শিক্ষাদান ও গ্রহণ একটি চলমান প্রক্রিয়া ১৭৯
বাড়িতে একটি ইসলামি লাইব্রেরি তৈরি করুন ১৭৯
শিশুদের গৃহ-সম্পর্কিত দুআ এবং ইসলামি নিয়মকানুন শিক্ষা দিন ১৮০
নেককার ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানানো ১৮২
ঘর থেকে নেতিবাচক প্রভাবগুলো দূর করুন ১৮৩
টেলিভিশন ১৮৩
গান-বাজনা হারাম ১৮৩
ছবি, মূর্তি এবং কুকুর ১৮৪
দ্বীন পালনে বাড়ির নির্মাণ-কাঠামোর ভূমিকা ১৮৫
বাড়িতে টেলিভিশন রাখা সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা ১৮৫
বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের পথে বিপত্তি ১৮৬
টেলিভিশন দেখা আধ্যাত্মিক ক্ষতি ১৮৭

অধ্যায় পনেরো : শিশুর সাথিদের প্রভাব ১৯০
সাথিদের ভূমিকা ১৯০
ভালো বন্ধু নির্বাচন ১৯১
আল্লাহকে ভালোবাসার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ১৯৪

অধ্যায় ষোলো : সামাজিক পরিবেশ ১৯৬
শিশুকে মুসলিম-জাতির সাথে সংযুক্ত করুন ১৯৭
'সামষ্টিক সচেতনতা' তৈরিতে কিছু ব্যবহারিক উপদেশ ১৯৭
শেষ কথা ১৯৮

লেখিকার পরিচিতি ২০০
রেফারেন্স ২০৪
প্যারেন্টিং সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করতে চাইলে ২০৬
অভিমত ২০৮
একনজরে ইসলামি পরিভাষা ২০৯

আলোচ্য বইয়ের উপর লেখিকার সাক্ষাৎকার

১. *প্যারেন্টিং (সন্তান-প্রতিপালন) নিয়ে লেখার অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে হতে কেন 'ঈমানের পরিচর্যা'কে আপনার বইয়ের প্রধান ফোকাস হিসেবে নির্বাচন করলেন?*

- বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আমি ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্তান প্রতিপালন-এর উপরে রচিত বিভিন্ন বই পড়েছি। অধিকাংশ বইয়ের বিষয়বস্তু ও আলোচনা একই ধরনের। বইগুলোতে প্রাথমিকভাবে ইসলামের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে, কিছু একটা অনুপস্থিত, আর সেটা হলো মানুষের মনোজগৎ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা—ঈমান ও ইখলাসের আলোচনা। মুসলিম সংখ্যা-প্রধান দেশে আমি অনেক বছর ধরে বসবাস করছি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতে এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা আলোচনা করা হয় না। হ্যাঁ, কীভাবে তারা সালাত আদায় করবে, সিয়াম পালন করবে, দুআ করবে ইত্যাদি সন্তানদের শেখানো হয়, কিন্তু ইখলাস, ঈমান ইত্যাদি বিষয়গুলোতে জোর দেওয়া হয় না। ফলে আমি অনুভব করেছি, আমাদের স্কুল-মাদরাসা এবং পরিবারগুলোতে সন্তানের ঈমানের যত্ন ও বিকাশ ঘটানোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। নিছক সাগরের ফেনারাশির মতো মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি না ঘটিয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রতি—যারা হবে সত্যিকারের মুমিন।

২. *আপনার বইয়ের ভূমিকাতে আপনি উল্লেখ করেছেন, সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর করার জন্য ইসলামি মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা জরুরি। পাঠকদের জন্য এই বিষয়টি একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বলবেন কি? কোন কোন সামাজিক ব্যাধির মাধ্যমে সুনির্দিষ্টভাবে শিশুরা আক্রান্ত হচ্ছে? ঈমানের মাধ্যমে কীভাবে এগুলোর প্রতিকার করা সম্ভব? পিতা-মাতা হিসেবে আমরা শিশুদেরকে কীভাবে এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারি?*

- মুসলিমদের অবস্থা হবে সাগরের ফেনার মতো, এর মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছি। নবিজি বলেছেন, 'শীঘ্রই বিভিন্ন জাতির লোকেরা

তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য পরস্পরকে আহ্বান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে অন্যকে আহ্বান করে।' জিজ্ঞেস করা হলো **'তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো?'** তিনি বললেন, 'না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত, কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এবং আল্লাহ শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন, তোমাদের অন্তরে **আল-ওয়াহান** ঢুকিয়ে দিবেন।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, **আল-ওয়াহান কী?**' তিনি বললেন, **'দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'**[১]

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর প্রধান রোগ হলো দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা! দুনিয়ার মোহে পড়ে মুসলিমরা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দিচ্ছে। পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসতে পারে। যখন তাদের অন্তরে এই ভালোবাসা এবং ঈমান থাকবে, তখন অন্যান্য সমস্যাগুলো সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে আনুগত্য অর্জিত হয়। মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে যে-শক্তি অর্জন করে সেই শক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার সকল পরীক্ষা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পারে। আর মুমিনের পরীক্ষাগুলো দৈনন্দিন জীবনে একের-পর-এক আসতেই থাকে।

৩. *দুনিয়াবি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিপরীতে ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও প্রাধান্য সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন।*

-আপনার প্রশ্নের জবাব আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমেও দেওয়া যায়। আপনি নিজে কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিবেন এবং কোন বিষয় অর্জনে অধিক প্রচেষ্টা ব্যয় করবেন? এমন কিছুকে প্রাধান্য দিবেন যা হয়তো গড়ে সত্তর বছর টিকবে নাকি এমন কিছুকে প্রাধান্য দিবেন যা অনন্তকাল টিকে থাকবে? আমার শব্দ নির্বাচন লক্ষ করলে দেখবেন আখিরাতের ক্ষেত্রে আমি বলেছি 'অনন্তকাল' এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে বলেছি 'হয়তো'। কারণ এই দুনিয়ার জীবনে কোনো কিছুর নিশ্চয়তা নেই। আগামীকাল আমরা এখানে থাকব কি না, কেউ বলতে পারি না। কাজেই দ্বিতীয় প্রশ্ন হওয়া উচিত, অনিশ্চিত বিষয়ের থেকে সুনিশ্চিত বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় কি?

যদি এতটুকু কেউ বোঝে তা হলে সে আরও বুঝতে পারবে যে তার পরিবারের প্রধান-লক্ষ্য হওয়া উচিত আখিরাতের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন করা। এই লক্ষ্য তো প্রত্যেক মুসলিমের থাকা উচিত।

আমি এ কথা বলছি না যে দুনিয়াবি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোনো গুরুত্ব নেই, বরং সঠিক নিয়ত থাকলে সেগুলো অর্জন করার মাধ্যমেও আল্লাহর ইবাদাত করা যায়, সাওয়াব

[১] আবূ দাউদ : ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ : ৫/২৭৮; সহীহ

লাভ করা যায়। বিপদ ঘটে তখনই যখন এগুলো শেখার পেছনে সঠিক নিয়ত থাকে না, অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বা দ্বীন ইসলামের খেদমতের জন্য সেগুলো শেখা হয় না। কিংবা যখন দুনিয়ার শিক্ষাটা হয় হারাম পদ্ধতিতে, হারাম বিষয়ের উপর। এরপর সেগুলোকে নানা রকম অদ্ভুত উপায়ে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সর্বাবস্থায় আমাদের আল্লাহকে স্মরণ রাখা উচিত, তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আমার সন্তান যেন প্রথমে সঠিক ও মজবুত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে। এটা নিশ্চিত করার পর অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. *ঈমান মজবুত করা তো বেশ কঠিন বিষয়! এমন কি বড়রাও এতে হিমশিম খেয়ে যায়! শিশুদের ঈমান মজবুত করতে এবং ঈমানের রুকনসমূহের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করতে আপনি কী উপদেশ দিতে চান?*

- যদিও এ প্রসঙ্গে আমার বইতে বিভিন্ন উদাহরণ এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, এরপরেও আমি বলব ঈমানকে মজবুত করার জন্য দুটি প্রধান চাবিকাঠি রয়েছে। প্রথম চাবিকাঠি হলো ইলম অর্জন করা। এ কারণে আমার বইয়ের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রয়েছে ইলম অর্জন প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ইলম অর্জনের সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ নিয়ামাত। ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। ইলম থাকলে আপনি বিভিন্ন পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে ও বুঝতে পারবেন, অথচ অধিকাংশ মানুষের সেই যোগ্যতা নেই। ইলমের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে শুধুমাত্র ঈমানই মজবুত হয় না, ইয়াকীন অর্জনের পথও সুগম হয়ে যায়। এগুলো বলে বোঝানো কঠিন।

যখন কেউ ইসলামের ব্যাপকতা, পরিপূর্ণতা এবং নিখুঁত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে এবং আল্লাহ তার সৃষ্টি জগতের উপর কী পরিকল্পনা রেখেছেন তা বুঝতে পারে—তখন সে সর্বান্তকরণে আত্মসমর্পণ করে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ঈমান এবং ইসলামকে দৈনন্দিন সকল কাজের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা। আমার বইতে এই বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বদা তিনি আমাদেরকে দেখছেন। এই দুনিয়ার সর্বত্র তিনি নিদর্শন উপস্থাপন করে রেখেছেন। এগুলো সবার সামনেই রয়েছে, কিন্তু আমরা খেয়াল করি না, শিক্ষা গ্রহণ করি না। ফলে কোনো উপকারও লাভ করতে পারি না।

অসংখ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রমাণিত হচ্ছে তিনিই একমাত্র সত্যিকারের ইলাহ। তিনি আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করেন। আমাদের সকল ঘটনায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তিনি সবকিছুর উপরে প্রভাব রাখেন। এগুলো আমরা যত জানব

তত বুঝতে পারব, আর সে অনুসারে তাফাক্কুর-তাদাব্বুর (চিন্তা ও গবেষণা) করতে পারব। যখন নিজেরা অভিজ্ঞতা অর্জন করব তখন সন্তানদের সাথেও শেয়ার করতে পারব। এভাবে দৈনিক অনেক সুযোগ আসবে যার মাধ্যমে সন্তানদের ঈমানের পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটাতে পারব।

৫. *মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেরকে বলুন, যদি শিশুদের সামনে কোনো শক্তিশালী মুসলিম রোল মডেল না থাকে তা হলে তাদের ঈমানের উপর কী প্রভাব পড়ে? আর যদি শিশুদের সামনে তার পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কেউ শক্তিশালী রোল মডেল (অনুকরণীয় আদর্শ) হয়, তা হলে তার উপর কতটুকু প্রভাব পড়ে?*

-পরিবারে কোনো শক্তিশালী 'রোল মডেল' ছাড়াও ঈমানের বিকাশ ঘটানো সম্ভব, কিন্তু রোল মডেল থাকলে তা বেশি কার্যকর ও প্রভাবশালী হয়। পিতা-মাতাকেই সেই রোল মডেল হতে হবে এটা জরুরি নয়, তবে প্যারেন্টিং এমন একটি দায়িত্ব যেখানে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিতা-মাতা অনেক সময় ও সুযোগ পেয়ে থাকেন যা অন্য কেউ পায় না। পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে অনেক সময় একত্রে কাটায়। আমার বইতে আমি আলোচনা করেছি শিশুরা দেখে দেখে নতুন বিষয় শিখে। আশেপাশের মানুষদের আচরণ নকল করার মাধ্যমেও শিশুরা শিখে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এ বিষয়টিকে বলে অবজারভেশনাল লার্নিং বা মডেলিং (observational learning or modeling)। শিশুর আচরণে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

বাস্তবে আমাদের সামনে তো শক্তিশালী রোল মডেল রয়েছেই। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তাঁর শিক্ষাগুলো এমন জীবন্তভাবে সংরক্ষিত যেন তিনি আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান। যখন কেউ হাদীস পড়বে, সীরাত পড়বে, সাহাবিদের ঘটনাগুলো জানবে তখন তার কাছে মনে হবে যেন তারা কাগজের পৃষ্ঠা ছিড়ে জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। সেই ঘটনাগুলো এত চমৎকারভাবে সংরক্ষিত আছে যেন একজন ব্যক্তি নিজের চোখের সামনে সেই রোল মডেলদেরকে দেখতে পায়। তাদেরকে 'অনুভব' করতে পারে। এটা ইসলামের একটি আশ্চর্যজনক বিষয় যে এত সূক্ষ্মভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামদের ঘটনাগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে। চৌদ্দশত বছর পরেও এসব রোল মডেল থেকেই আমরা সকল উপকার লাভ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আধ্যাত্মিক রোল মডেল এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

৬. *আপনার বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে আপনি লিখেছেন, শিশুদের ফিতরাত (যে সহজাত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শিশুরা আল্লাহকে চিনতে পারে) পিতা-মাতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক নিয়ামাত। ব্যাখ্যা করে বলবেন কি, শিশুদের ফিতরাত কীভাবে পিতা-মাতার জন্য একটি নিয়ামাত? এই নিয়ামাতকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমরা শিশুদেরকে (ঈমান) শিক্ষা প্রদান করতে পারি?*

- এই বিষয়টি আমার বইয়ের উক্ত অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তবে আপনার প্রশ্নের খাতিরে আমি এখানে একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। ধরুন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেডিসিন-শাস্ত্রকে খুব ভালোবাসে এবং সে চিকিৎসক হতে চায়। বায়োলজি-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে তার খুব আগ্রহ, এসব সাবজেক্টই তার কাছে সহজ লাগে। এই ছাত্রটি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে এবং মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবে তখন তার কাছে এটা খুবই সহজ এবং আনন্দদায়ক মনে হবে। সেই একই ছাত্রকে যদি জোর করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠানো হয় তবে সেটা তার জন্য খুবই কষ্টকর অভিজ্ঞতা হবে। বিষয়টি তার কাছে কঠিন মনে হবে এবং হয়তো সে ক্লাস ফাঁকি দিতে শুরু করবে।

অনুরূপভাবে, ফিতরাত হলো আমাদের জন্মগত সহজাত বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে আল্লাহর উপর আমরা ঈমান আনি এবং এককভাবে তার ইবাদাত করি। এটি পিতা-মাতার উপরে এক বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা, এই বৈশিষ্ট্যের কারণে শিশুদেরকে (ঈমান) শেখানো খুব সহজ, ঠিক যেভাবে একজন মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছে মেডিসিন অধ্যয়ন করা অন্য বিষয় থেকে সহজ। শিশুদেরকে ফিতরাতের বিপরীত কিছু শেখানোই বরং কঠিন কাজ। কাজেই এই নিয়ামাতকে কাজে লাগিয়ে আমরা দুইভাবে শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করতে পারি।

এক, শৈশব থেকেই শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করা। শিশুরা জন্ম থেকেই শিখতে শুরু করে এবং তখন তাদের ফিতরাত সবচেয়ে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। দুই, তাওহীদের উপর মনোযোগ প্রদান করা এবং ঈমানের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দেওয়া যেভাবে সেগুলো কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমান যুগের মুসলিমরা তাওহীদের গুরুত্ব ভুলে গেছে। তারা নানা রকমের ভ্রান্ত মতাদর্শ ও বিধর্মীদের চিন্তা চেতনা দ্বারা পথভ্রষ্টতায় পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের উচিত তাওহীদের গুরুত্ব পুনর্জাগরণ করা, শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য নয় বরং আখিরাতকে সামনে রেখে এর পুনর্জাগরণ করতে হবে। কেননা, একমাত্র তাওহীদের মাধ্যমেই জান্নাতের গেট খুলবে।

৭. *বর্তমান দুনিয়ায় নানাভাবে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে 'সবখানে ধর্ম টেনে আনবে না' (compartmentalization of beliefs)। তুমি সালাত আদায় করো ঠিক আছে, কিন্তু কাজের সময় নয় বা স্কুলে নয়। তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো ঠিক আছে, কিন্তু সবখানে নিজের ধর্ম বিশ্বাসের কথা বলবে না। কীভাবে আমরা এসব চিন্তাধারার মোকাবিলা করতে পারি? কেননা এই পরিবেশেই তো শিশুদেরকে ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে হবে।*

-এক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমরা কাফিরদের ফাঁদে ধরা দিয়েছে। দ্বীন থেকে দুনিয়া পৃথক করা তাদের সেক্যুলার পদ্ধতি। এটিও দুনিয়াকে ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত যা নিয়ে শুরুতে আমি কথা বলেছি। আমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে হবে যে ইসলাম

নিছক একটি ধর্ম নয়, বরং এটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। এমনভাবে ইসলামকে ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে দৈনন্দিন ছোটখাটো বিষয়েও দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আমাদের প্রতিটি কাজ, প্রত্যেকটি নিয়ত যেন শারীআ মোতাবেক আল্লাহর জন্য হয়। তা হলে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ পরিণত হবে ইবাদাতে। একমাত্র এই পদ্ধতিতেই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হবে। অন্যথায় আমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে অন্যান্য বিষয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করব। সামাজিক চাপ, বন্ধু-বান্ধবদের চাপ, অন্যের কাছে জাজমেন্টেড হওয়া অথবা কে কী বলল ইত্যাদি বিষয়ের উপর আত্মসমর্পণ করে দ্বীন পালনে সংকোচ বোধ করব। কিন্তু আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং অন্য সবার থেকে তাকেই বেশি ভয় করতে হবে।

৮. *আজকাল নারীদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা হয়। মানুষ চায় নারীরা একসাথে সবকিছু সামলাবে। যেমন : বিয়ে, পরিবার, সন্তান, ক্যারিয়ার, সমাজসেবা, উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি সামলে নিয়ে 'সেরা মা'-এর ভূমিকাতে তাদেরকে আবির্ভূত হতে হবে। নারীদের প্রতি এই ধরনের মানসিকতার কারণে মুসলিম পরিবারগুলো কীভাবে প্রভাবিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? যে মা এতকিছু সামলাতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছেন, এ ক্ষেত্রে তার সন্তানের মনোজগতে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে?*

-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ করার সুবাদে আমি দেখেছি কীভাবে মেয়েদের কাছ থেকে একসাথে এতকিছু প্রত্যাশা করা হয়। তাদেরকে একইসাথে উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি অর্জন করতে হয়, আবার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়। তাদের অনেকেই 'ক্যারিয়ার গোল' অর্জন করার চাপে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে দেরি করে এবং পরিবার গঠন করতে পারে না। আমি অনেক নারী শিক্ষার্থীদের কাউন্সেলিং করেছি যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে চায় না কিংবা তাদের সেই সামর্থ্য নেই, অথচ পিতা-মাতার চাপে কিংবা সামাজিক চাপে বাধ্য হয়ে তাদেরকে পড়ালেখা করতে হচ্ছে। তারা প্রচুর মানসিক চাপের শিকার হয় এবং উদ্‌বিগ্নতা, বিষণ্ণতা ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে যায়। এ বিষয়টি মুসলিম বিশ্বেও ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং এক্ষেত্রেও আমরা অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ করছি, অথচ মাতৃত্বের দায়িত্বের প্রতি অবহেলার কারণে অমুসলিমদের পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমি বিশ্বাস করি মুসলিম পরিবারগুলোতে ইতোমধ্যে এর মারাত্মক প্রভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের উপরে এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। যখনই মানুষ আল্লাহর নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখনই সূক্ষ্ম ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। সবশেষে তারা নিজেরাই ভুক্তভোগী হয়েছে।

মেয়েদের জন্য মাতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্মানিত একটি কাজ। পরিবার ও সমাজের সঠিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাতৃত্বের ভূমিকার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য মায়ের কোনো বিকল্প নেই। সারা দুনিয়ার সব মানুষদের থেকে তাদের কাছে

মা বেশি মূল্যবান। অন্য কারও মাধ্যমে সেই অভাব পূরণ করা যায় না।

আমাদের সন্তানদের প্রতি, মেয়েদের প্রতি এই বার্তাটি বিশেষভাবে পৌঁছে দেওয়া খুবই জরুরি যে, তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে এবং উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা মাতৃত্বকে একটি লাইফ টাইম (জীবনব্যাপী) ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। বাড়ির বাইরে কাজ করা মেয়েদের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, আমি এ কথা বলছি না। কেননা, আমাদের মেয়েদের জন্য নারী শিক্ষক, নারী ডাক্তার ইত্যাদি পেশাজীবীদের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই বিষয়ে (সামাজিক বনাম পারিবারিক প্রয়োজন পূরণ করা) ক্রমধারা বজায় রেখে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ বিষয়ে আমি একটি পৃথক গ্রন্থ লিখছি, কারণ এটি বর্তমান সময়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। (কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)।

৯. *বর্তমান বিশ্বে যেভাবে মুসলিমদেরকে নজরদারী করা হয় এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা হয়, এই পরিবেশে সন্তানদের মধ্যে কীভাবে একটি ইতিবাচক সেলফ-ইমেজ (আত্ম-পরিচয়) বিকাশে উৎসাহিত করতে পারি এবং কীভাবে ইসলামি পরিচিতিকে আঁকড়ে ধরতে তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারি?*

-যখন শিশুদের ঈমান শক্তিশালী হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে ও ইসলামিক আইডেন্টিটিকে তারা আঁকড়ে ধরবে। এ বিষয়গুলো ঈমানের সাথে যুক্ত। এ কারণে বর্তমান সময়ের শিশুদের ঈমানের বিকাশ ঘটানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চারদিকে ইসলামকে কলুষিত করে উপস্থাপনের জন্য এত এত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে যে, এই কঠিন সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে হবে। সম্প্রতি আমি নারীদের মানসিক-স্বাস্থ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে স্পেন গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি এ ধরনের কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি দেখেছি মুসলিমদের প্রতি অন্য মানুষেরা কত নেতিবাচক ও বিদ্বেষমূলক মানসিকতা রাখে।

তাদের আচরণের কারণে অনেক সময় মনে হয় যেন জমাটবাঁধা বরফ দিয়ে অন্তরকে চেপে ধরা হয়েছে। কিন্তু ইয়াকীনের (সুদৃঢ় ঈমান) মাধ্যমে সহজেই সেই হিমশীতল বরফকে গলানো যায় এবং অন্তরে তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করা যায়।

আপনি সত্যের পথে রয়েছেন। তারা যাই বলুক না কেন কিংবা যাই করুক না কেন— তারা কখনও সেই সত্যকে আপনার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এই অনুভূতির মাধ্যমে অন্তরে তৃপ্তি লাভ করা যায়। আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হোন না কেন, দুনিয়াবি স্বার্থে কখনও নিজের বিশ্বাসে ছাড় দেওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে নবিজি ﷺ-এর একটি হাদীস মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছেন, 'ইসলামের শুরু অপরিচিত অবস্থায় এবং শীঘ্রই

তা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। কাজেই সেই অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ!' [২]প্রশ্ন করা হলো, 'কারা সেই অপরিচিত (গুরাবা), ইয়া রাসূলুল্লাহ?' তিনি জবাব দিলেন, 'মানুষ কলুষিত হয়ে যাবার পর, যারা তাদেরকে সংশোধন করতে থাকে।' আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'লোকেরা সুন্নাহ বিকৃত করার পর, যারা আমার সুন্নাহকে সংশোধন করে।' আরেকটি বর্ণনা অনুসারে এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, '(তারা) কলুষিত সমাজে বসবাসকারী অল্পসংখ্যক সৎলোক। তারা সমাজের প্রচলিত রীতি-বিরোধী।'[৩]

সুতরাং সারকথা হলো, আমাদের খুশি হওয়া উচিত, গর্ব অনুভব করা উচিত যে আমরা সেই গুরাবা—যাদেরকে নবিজি সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তারা সুন্নাহ অনুসরণ করে এবং মানুষদেরকে ইসলামের দিকে ডাকে।

১০. *শিশুদের ঈমান বিকাশের ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন, ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসা এবং মায়া-মমতার কি সম্পর্ক রয়েছে?*

- আমি বিশ্বাস করি এই বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে খুবই জরুরি। আমার মনে পড়ে, যখন আমি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী হিসেবে ক্লাস করতাম তখন আমাকে শিখানো হয়েছিল, **শাসন করা তখনই কাজ করবে যখন পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে একটি মজবুত পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকবে।** যদি পারস্পরিক সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতা না থাকে তা হলে যতই শাসন করা হোক না কেন— শিশুদের আচরণকে পরিবর্তন করা যায় না—শাসনের কোনো প্রভাবও দেখা যায় না। আমি বিশ্বাস করি শিশুদের ঈমান বিকাশের ক্ষেত্রে একই মূলনীতি কাজ করে। যদি আমরা শিশুদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও সুসম্পর্ক তৈরি করতে সময় না দিই তা হলে আমাদের অন্যান্য প্রচেষ্টা খুব একটা সফলতার মুখ দেখবে না। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় মায়া-মমতা, ভালোবাসা, একত্রে সময় কাটানো, মজা-করা, দুঃখের বিষয় ভাগাভাগি করা ইত্যাদির মাধ্যমে। এভাবে যখন একটি বন্ধন তৈরি হয়ে যায়, তখন শিশুরা অনেক বেশি ইতিবাচক সাড়া প্রদান করে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এর জন্য অনেক সাধনা ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

১১. *শিশুদের ঈমান বিকাশের চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ঈমান কীভাবে বিকশিত হতে পারে ?*

-এ বিষয়টি আমি আমার বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, সন্তান পরিচর্যার দায়িত্বের মাধ্যমে সহজাতভাবেই আমাদের ঈমান বিকশিত হয়। শিশুদের সাথে সাথে আমরাও শিখতে থাকি ও বড় হতে থাকি। যখন আমরা শিশুদেরকে কোনো কিছু শিখাতে চাই এবং তাদের জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে চাই,

[২] বুখারি : ২৭০
[৩] মুসলিম : ১৪৫

তখন সবচেয়ে কার্যকরী ফল অর্জনের জন্য নিজেদের ঈমান বিকশিত করা এবং নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে যায়। এটা সন্তান প্রতিপালনের একটি অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

১২. *এবারে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। আপনার কাছে জানতে চাই, মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আপনার ঈমান কীভাবে বিকশিত হয়েছে?*

- সন্তান প্রতিপালন কোনো সহজ কাজ নয়। এর মধ্যে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে কিন্তু আমি অনুভব করেছি প্যারেন্টিং-এর মাধ্যমে আমার নিজের ঈমানের উন্নতি এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছি সকল কঠিন অবস্থাতেই সাহায্য করার জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রয়েছেন, তিনি আমাদেরকে গাইড করেন এবং প্রতিটি কষ্টের পুরস্কার প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারের শুরুতে আমি আল্লাহর বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে কথা বলেছি এবং সন্তান পরিচর্যার দায়িত্বের মাধ্যমে একজন মানুষ সেগুলো বাস্তবে অনুভব করতে পারে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার নিজের ঈমান ও ইয়াকীন অর্জিত হয়। সন্তান পরিচর্যার মাধ্যমে যে 'গুপ্ত-ভাণ্ডার' অর্জন করা যায় তা খুব কমসংখ্যক মানুষ আবিষ্কার করতে পারে।

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বের মাধ্যমে অনেকভাবে—আপনি আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য লাভ করবেন। যেমন কখনও অনুভব করবেন যে পশ্চিমা দেশ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিতে চলে যাওয়া উচিত অথবা এমন হতে পারে সেখানে আপনার শিশু বা কিশোর সন্তানের জন্য একজন ভালো মুসলিম বন্ধু পেয়ে যাবেন। এবং সে আপনাকে এমন এমন কিছু তথ্য বা জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করবে যাতে আপনার সন্তানের উপকার হবে।

আরেকভাবেও নিজের ঈমান গঠিত হয়, যখন আপনি নিজের কষ্টের ফল চোখের সামনে দেখতে পাবেন। হয়তো একদিন দেখলেন আপনার সন্তান এসে বলছে যে তার স্কুল-টিচার ভুলে পরীক্ষার খাতায় এক নম্বর অতিরিক্ত দিয়েছে! অথবা আপনার সন্তান বলবে যে স্কুলের পরীক্ষাতে অন্য বাচ্চারা দেখাদেখি করছিল কিন্তু সে কারও থেকে কিছু দেখে লেখেনি বা জিজ্ঞাসাও করেনি! আবার এমন হতে পারে, কিশোর বয়সে সন্তান যখন নিজের জন্য কিছুটা স্বাধীনতা চায়, কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করে, সেই সময়ে হয়তো নিজে থেকেই একদিন আপনার পাশে সালাতে এসে দাঁড়াল!

এভাবেই বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে আপনার প্রচেষ্টার পুরস্কার লাভ করবেন। আল্লাহ এভাবেই তার সৎকর্মশীল বান্দাদের অনেক পুরস্কার দুনিয়াতেই প্রদান করেন। আর আখিরাতের যে পুরস্কার জমা রইল সেটা এত বেশি—যা আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদ বানিয়ে দিন। আমীন।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তাঁর কাছে হিদায়াত চাই। আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নফসের অনিষ্ট হতে এবং মন্দ আমলের অনিষ্ট হতে। যাকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

‘হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় (তাকওয়া) করতে থাকো। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১০২)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

‘হে মানবজাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দুজনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। সেই আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক আদায় করে থাকো এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া নজর রেখেছেন।’ (সূরা নিসা, ৪ : ১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।' (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

বর্তমান পৃথিবীতে শিশু ও পরিবারের পারস্পরিক অবস্থার চিত্র খুবই করুণ। এটা একজন ব্যক্তিকে বিমর্ষ ও হতভম্ব করে দেয়। পরিবার কাঠামো ভেঙে পড়ছে, বিচ্ছেদ ও তালাকের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, একক পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব, পিতা ছাড়া শিশুর বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বিষয়গুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন এগুলো কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং স্বাভাবিক চিত্র! প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে পরিবারের সদস্যরা একত্রে থেকেও সবাই সবার থেকে পৃথক, একত্রে সময়-কাটানো এখন বিরল অভিজ্ঞতা। পুরো মানব-ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। শিশুরা পিতা-মাতার সাথে অন্তরঙ্গ ও অর্থবহ কথোপকথনে পুরো সপ্তাহে তিরিশ মিনিট সময় ব্যয় না করলেও টিভি, কম্পিউটার ও মোবাইল গেইমের পিছনে সপ্তাহে বিশ ঘণ্টা বা আরও বেশি সময় নিমগ্ন থাকছে। মায়েরা অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অধিক হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময়ের জন্য সন্তানকে ছেড়ে যাচ্ছেন কাজের লোক বা অপরিচিত মানুষদের তত্ত্বাবধানে। সমস্যার তালিকা অনেক দীর্ঘ।

এ যুগের পরিবারগুলোর সবচেয়ে লক্ষণীয় ধারা হলো নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়। পাপাচার, নীতিহীনতা ও লাম্পট্য দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা। প্রতারণা, জুয়া, অ্যালকোহল ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার, বিবাহপূর্ব বা বিবাহ-বহির্ভূত-সম্পর্ক ও অন্যান্য অনাচারগুলো পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে একটি সাধারণ ও গ্রহণযোগ্য ঘটনা হয়ে গেছে। শিশু ও পরিবারের পারস্পরিক সম্পর্কে তিনটি বিপজ্জনক অগ্রহণযোগ্য কাজ হলো **অবাধ্যতা**, **অসততা** এবং **অশ্রদ্ধা।**

পিতা-মাতার কথা শোনা ও তাদেরকে শ্রদ্ধা করা আজকের শিশু-কিশোরদের কাছে কোনো জরুরি বিষয় নয়। বন্ধুদের খুশি করার জন্য কিংবা দুনিয়াবি আনন্দের জন্য তারা যে-কোনো অবাধ্যতা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে। এতে তাদের কোনো অনুশোচনা নেই, এমনকি দ্বিতীয়বার ভেবে দেখারও প্রয়োজন মনে করে না। এই অশুভ ব্যাধির বিস্তারকে অবশ্যই গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম পরিবারগুলোও এ-সকল সমস্যা ও ঘটনা থেকে রেহাই পায়নি। পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিম পরিবারগুলো এ-সকল সমস্যায় প্রতিনিয়ত

সংগ্রামরত। আর যেহেতু বিশ্বায়নের করাল গ্রাস সারা দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছে, ফলে সব দেশের মুসলিমরাই এতে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। যদিও-বা 'গ্লোবালাইজেশন' পরিভাষার মাধ্যমে নিছক কিছু অর্থনৈতিক বিষয়াদি বোঝানোর কথা ছিল, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর উপর বিশ্বায়নের এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে কেবল পণ্যসামগ্রী ও সেবা আমদানি হচ্ছে না, বরং আদর্শ, মতবাদ, নৈতিকতার আমদানি ঘটছে; অথচ এগুলো ঐতিহ্যগত বিশ্বাস এবং আচার-আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলো আমদানির প্রধান মাধ্যম হলো মিডিয়া। মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং ম্যাগাজিনসমূহ। আজকের দুনিয়ায় একটি আমেরিকান-শিশু যে-সকল অসার, কাল্পনিক ও নীতিবিবর্জিত দূষিত বিষয়বস্তুর সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে ঠিক সেভাবে পৃথিবীর অপর প্রান্তের আরেকটি শিশু একই অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। একদিকে শিশু-কিশোররা হামলে পড়ে নিজেদেরকে পশ্চিমা মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করতে চাচ্ছে, আরেকদিকে পুরনো প্রজন্মের মানুষেরা নিজেদের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পরিচয় টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দিচ্ছে আন্তঃপ্রজন্ম-সংঘাত এবং উল্লিখিত তিনটি **'অগ্রহণযোগ্য কাজ'** অর্থাৎ **অবাধ্যতা**, **অসততা** এবং **অশ্রদ্ধা।**

(পশ্চিমা সমাজের) এই অবক্ষয়গুলো ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবার ও সমাজকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে প্রত্যেক প্রজন্মে ইসলামি মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম সংখ্যাপ্রধান দেশেও আজকাল এই দৃশ্য আর বিরল নয় যে উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েরা একত্রে বাধাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেয়েরা মোটেও ইসলামি পোশাকের (ইসলামিক-ড্রেস-কোড) তোয়াক্কা করে না, বরং তারা মেকআপ-পারফিউমে সুসজ্জিত থাকে। ছেলেমেয়েরা অবাধে ইন্টারনেট চ্যাটিং, ইমেইল এবং ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করছে। কিশোর-অপরাধ, মাদকের ব্যবহার ও নানাবিধ অপকর্মের গ্রাফ আজ ঊর্ধ্বমুখী। এর বাইরেও রয়েছে নানান অবৈধ সম্পর্কের ব্যাধি।

সমাধান : এসব দৃশ্যের সাথে আমরা সবাই পরিচিত কিন্তু এই বইয়ের আলোকপাত সমস্যার প্রতি নয়, বরং সমাধানের প্রতি। কেননা এ সকল সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যার সমাধান প্রত্যেক মুসলিমের হাতের নাগালেই রয়েছে। আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগুলো সমাধান করা সম্ভব। সমাধান রয়েছে অবশ্যই ইসলামের মধ্যে। সমাধান রয়েছে এই সম্মানিত দ্বীন ও নীতি-নৈতিকতায়-পরিপূর্ণ-জীবন-বিধানে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে। এটাই একমাত্র কার্যকর ও টেকসই সমাধান। কেননা তিনিই এই সমাধান প্রদান করেছেন—যিনি আমাদের রব—যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আমাদের মানবিক স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের নিজেদের থেকেও ভালোভাবে জানেন। তাঁর বাতলে-দেওয়া সমাধান ব্যতিরেকে যত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে, সবই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামের মাধ্যমে সমাধানের বিষয়টি কোনো নতুন ধারণা বা প্রস্তাবনা নয়। মানবজাতির শুরু থেকেই এই সমাধান পেশ করে এসেছেন সকল আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, নেক ব্যক্তিবর্গ এবং উলামায়ে কেরাম। তারা মানুষদেরকে জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করেছেন এবং যাবতীয় ধোঁকা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হলো সেই আহ্বানের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে একটি পুনর্জাগরণ ঘটানো এবং চিরায়ত ইসলামি মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় সামাজিক ব্যাধির এটাই প্রকৃত ঔষধ। এটাই শয়তানের বিরুদ্ধে একমাত্র সুদৃঢ় সুরক্ষা। আল্লাহর বিধান হতে বিচ্যুতির মাধ্যমে কেবল ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলাই বৃদ্ধি পায়, আর আল্লাহর নির্ধারিত জীবন বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বত্র কাঙ্ক্ষিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষদেরকে সেই ঔষধ গ্রহণে রাজি করানোটাই প্রধান চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন প্রাণপণ প্রচেষ্টা। উপরন্তু এটি একটি জীবনব্যাপী নিরাময়-প্রক্রিয়া যা আমৃত্যু চলমান থাকবে।

এই বইয়ের প্রধান মনোযোগ আগামী প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে শৈশব থেকেই ঈমান ও ইসলামি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো ও প্রতিপালন করা। যারা জন্ম থেকেই ইসলামের প্রতিষেধক গ্রহণ করে এসেছে তাদের জন্য জীবনব্যাপী এই সমাধানের উপর লেগে থাকা খুব সহজ। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের মধ্যে এটা সহজাতভাবে প্রবাহিত হয়। বাস্তবে শিশুদের মধ্যে একটি বিশেষ যোগ্যতা রয়েছে যার নাম **ফিতরাত**। ফিতরাত হলো সহজাত, জন্মগত মানবিক বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে ও ঈমান অর্জন করতে পারে। প্রতিটি মানব-শিশুর অন্তরে ঈমানের বীজ সৃষ্টিগতভাবেই বপন করা থাকে। প্রয়োজন শুধু পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটানো, যেন সেই বীজ হতে আমরা কাঙ্ক্ষিত ফলে-ফুলে শোভিত বৃক্ষ পেতে পারি। এ কারণেই এই বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে, 'Nurturing Eeman in Children'—'শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা '।

এই কোর্সের ধারাক্রম থেকে আরও প্রত্যাশা করছি, যারা এই প্রতিষেধকের তদারকি করবে তারা নিজেরাও শিখবে এবং নিজেদের মধ্যে ইসলামের বিকাশ ঘটাবে। সাধারণত অন্যকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি শেখে এবং এটি হলো প্যারেন্টিং তথা সন্তান প্রতিপালনের অন্যতম প্রধান অর্জন। যখন আমরা সন্তানের দিকে তাকিয়ে ভাবি, বড় হয়ে তারা কী হবে—তখন সেই প্রশ্নগুলো মূলত আমাদের দিকে উত্থিত হয়। যখন শিশুদেরকে আমাদের আচরণ নকল করতে দেখি, তখন নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত—আমরা কি চাই শিশুরা আমাদের ওই আচরণগুলো অনুকরণ করুক? আমরা কি তাদের সামনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি? দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের সন্তান ও পরিবারের জন্য আমরা আসলে কী চাই?

এই বইটি নিছক ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে সন্তান প্রতিপালনের উপর রচিত নয়। কেননা এই বিষয়ে বহু কিতাব রচিত হয়েছে। কীভাবে একজন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে; সে বিষয়েও এই বইটি রচনা করা হয়নি। কেননা এসব বিষয়ের সাথে আমরা ইতোমধ্যেই পরিচিত। কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, সিয়াম পালন করতে হয়, যাকাত প্রদান করতে হয় ইত্যাদি আমরা সবাই কমবেশি জানি। বরং এই বইটি হলো মুসলিম পিতা-মাতাদের প্রশিক্ষিত করার একটি প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে তারা নিজের ও সন্তানদের ঈমানকে পরবর্তী ধাপে উন্নীত করতে পারেন। আর সেই কাঙ্ক্ষিত ধাপ হলো ঈমানের উচ্চতর অবস্থা—ইখলাস এবং তাকওয়া অর্জন করা। এই বইটি প্রত্যেক মুসলিমের মন ও মননকে প্রভাবিত করার একটি প্রচেষ্টা, যেন এর মাধ্যমে তাদের ঈমান শক্তিশালী হয় এবং সমাজের অনাচার ও শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে তাদের অন্তরগুলো সুরক্ষিত থাকে। এই বইটির মাধ্যমে শিশুদেরকে সেই শিক্ষা প্রদান করতে আহ্বান করা হয়েছে যার মাধ্যমে নামসর্বস্ব মুসলিম না হয়ে তারা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে। আল্লাহর উপর ঈমানের প্রকৃত অর্থ কী, কীভাবে জীবনের প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক গ্রহণ করতে হয় এবং তাওহীদের অর্থ ইত্যাদি শিক্ষাগুলো অবশ্যই শিশুদেরকে প্রদান করতে হবে। আমরা স্বপ্ন দেখি একদিন তাদের মধ্য থেকেই আদর্শ দাঈ, আন্তরিক ইলম অন্বেষক, নির্ভীক মুজাহিদ, সমাজ-সংস্কারক এবং পবিত্র স্ত্রী ও মমতাময়ী মা তৈরি হবে।

বিশুদ্ধ ঈমান হলো সেই পরশপাথর যার মাধ্যমে মুমিনরা পরিপূর্ণভাবে ইসলাম বাস্তবায়নের দিকে পরিচালিত হয়। তাদের নিজেদের জীবনে, পরিবার এবং সমাজে ইসলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে হারানো মূল্যবোধসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলাম-প্রদর্শিত প্রশান্তি অর্জিত হয়।

প্রথম পর্ব

শিশুমনে ঈমান পরিচর্যার ভিত্তি

শিশুমনে ঈমান পরিচর্যা ও বিকাশের ভিত্তিসমূহ ইসলামের মূলনীতি-বিষয়ক জ্ঞান, প্যারেন্টিং, মানব প্রকৃতি এবং ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অংশে আলোচিত বিষয়গুলো হলো : আকীদা, ঈমান এবং ইহসান; প্যারেন্টিং-এর দায়িত্ব এবং মৌলিক বিষয়াদি; ইসলামের জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাপ্রদান; ফিতরাত : মানুষের সহজাত প্রকৃতি যা শিশুদের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এগুলোর মাধ্যমে পিতা-মাতা একটি মজবুত ভিত্তি নির্মাণ করতে পারবেন। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তারা সহজে সন্তান লালন পালন এবং মানসিক বিকাশ ঘটাতে পারবেন।

অধ্যায় এক

আকীদা, ঈমান এবং ইহসান

আকীদা এবং ঈমানের মূলনীতিসমূহের মাধ্যমে দ্বীনের ভিত্তি গঠিত হয়। সন্তান প্রতিপালনের জন্যেও এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিভাষাসমূহের অর্থ এবং সন্তান প্রতিপালনের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

আকীদা শব্দের অর্থ

আকাঈদ (আকীদা শব্দের বহুবচন) হলো সে-সকল বিষয় যা মানুষের অন্তর দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে ও বিশ্বাস করে—যে বিষয়গুলোকে মানুষ সত্য বলে মেনে নেয়। এটি হলো সুনিশ্চিত এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলামের ক্ষেত্রে, এটি হলো সে-সকল জ্ঞানগত বিষয় যা বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে এসেছে।[৪] আল্লাহ বলেছেন,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

> ‘রাসূল বিশ্বাস রাখেন ওই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।’ (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৫)

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু একমাত্র

[৪] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ২৯-৩১

সত্য আকীদা রয়েছে দ্বীন ইসলামের মধ্যে, কারণ এটাই হলো একমাত্র পরিপূর্ণ, নিখুঁত এবং সুরক্ষিত দ্বীন। আল্লাহ বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামাত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি।' (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৩)

অন্যত্র তিনি বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

'আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।' (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে যা-কিছুর আদেশ দিয়েছেন তার কিছুই আমি বাদ রাখিনি। আমিও তোমাদেরকে সেগুলোর আদেশ করেছি। আল্লাহ তোমাদেরকে যা-কিছু থেকে নিষেধ করেছেন তার কিছুই আমি বাদ দিইনি। আমিও তোমাদেরকে সেসব থেকে নিষেধ করেছি।'[৫]

আল্লাহ তাআলা কুরআন এবং ইসলামকে কিয়ামাত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

'আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।' (সূরা হিজর, ১৫ : ৯)

কুরআন এবং হাদীসে প্রাপ্ত আকীদা দলিল প্রমাণের মাধ্যমে মানুষের মনকে সন্তুষ্ট করে এবং অন্তরকে ঈমান, ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ও নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে। অন্যান্য ধর্মগুলো শুরু থেকেই মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত কিংবা পরবর্তীকালে বিকৃত হয়েছে, যদিও বিচ্ছিন্নভাবে অল্প কিছু সত্য সেখানে থাকুক না কেন।[৬]

ইসলামি আকীদার গুরুত্ব

মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ইসলামি আকীদা ঠিক ততটাই জরুরি যতটা জরুরি পানি এবং বাতাস। বিশুদ্ধ আকীদা ব্যতিরেকে মানুষ পথহারা ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এটাই একমাত্র আকীদা যা

[৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান : ১১৮৫, হাসান।
[৬] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ৩৪

শতাব্দীর-পর-শতাব্দী-ধরে-চলে-আসা সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম। 'আমি কে, কোথায় ছিলাম, কোত্থেকে এসেছি, এই বিশ্বজগৎ কীভাবে সৃষ্টি হলো, কে এর স্রষ্টা, কেন তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কেন এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, এই মহাবিশ্বে আমাদের ভূমিকা কী, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কী, আমরা খালি চোখে যে দৃশ্যমান দুনিয়া দেখি এর বাইরেও কি অন্য কোনো জগৎ রয়েছে? দুনিয়ার জীবন শেষ হবার পর কি অন্য কোনো জীবন রয়েছে?'—এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন সৃষ্টির শুরু থেকে চলে এসেছে। এগুলোর একমাত্র উত্তর রয়েছে ইসলামে।[৭]

আকীদা এবং ঈমানের পারস্পরিক সম্পর্ক

ঈমানের মূল উপাদান ও ভিত্তি গড়ে ওঠে আকীদার উপর। ঈমানের মূল বুনিয়াদ হলো আকীদা যা অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ঈমানের ঘোষণা মৌখিকভাবে প্রদান করতে হয় এবং কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন করতে হয়। শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য ঈমানের জন্য বিশুদ্ধ আকীদা ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন ব্যক্তি আকীদা সম্পর্কে যত বেশি ইলম অর্জন করবে, তার ঈমান তত বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নততর হবে।[৮]

ঈমান এবং মুমিন এর অর্থ

ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাস যা একজন ব্যক্তির আকীদা হতে উৎসারিত হয়। এই বিশ্বাস একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, কথা ও কাজকে প্রভাবিত করে। ইসলামের আকীদা খুবই ব্যাপক এবং বিশদ, কিন্তু এর ছয়টি মৌলিক খুঁটি রয়েছে, সেগুলো হলো—আল্লাহর উপর ঈমান, ফেরেশতা, নবি-রাসূলগণ, কিতাবসমূহ, বিচার-দিবস তথা আখিরাত এবং তাকদীরের উপর বিশ্বাস। 'ঈমান' এবং 'মুমিন' এর প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের লক্ষ্যে আমরা একটি সুপরিচিত হাদীসের দিকে মনোযোগী হতে পারি। সেই হাদীসে ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। নবিজি বিজ্ঞতার সাথে সকল প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, 'আমরা একদিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে বসা। এমন সময় আচমকা এক ব্যক্তি এসে হাজির; পরনে পোশাক ধবধবে সাদা, চুল লিকলিকে কালো, শরীরে সফরের কোনো ছাপ নেই, আমাদের কেউ তাকে চিনতেও পারছে না! একপর্যায়ে লোকটি নবি (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে বসে; এরপর তার হাঁটু দুটি নবি (ﷺ)-এর দু-হাঁটুর সঙ্গে লাগায় এবং তার হাতের

[৭] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ৩৫
[৮] আল-আশকার, Belief in Allah, পৃ : ৩৯-৪০

তালু দুটি নিজের রানের উপর রাখে। এরপর বলে, মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানান। নবি (ﷺ) বলেন, ইসলাম হলো—তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বার্তাবাহক, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং আল্লাহর ঘরে পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করবে। লোকটি বলে, আপনি সত্য বলেছেন। তার কথায় আমরা বিস্মিত হই—সে প্রশ্নও করছে, আবার সত্যায়নও করছে!

এরপর সে বলে, তা হলে আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। নবি (ﷺ) বলেন, (ঈমান হলো—) তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, গ্রন্থাবলিও বার্তাবাহকবৃন্দ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে; এবং তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদীরের ভালো-মন্দের উপর। সে বলে, আপনি সত্য বলেছেন। আমাকে ইহ্সান বা মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন। নবি (ﷺ) বলেন, (ইহ্সান বা মহত্ত্ব হলো—) তুমি এমনভাবে আল্লাহর গোলামি করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; যদি তুমি তাঁকে দেখার পর্যায়ে না হও, তা হলে তিনি তোমাকে নিশ্চিত দেখছেন!"[৯]

একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের বইয়ের শিরোনাম **'শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা'** (Nurturing Eeman In Chindren) নির্বাচন করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি, ইসলাম এবং ঈমানের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে এবং মুসলিম ও মুমিনের মধ্যেও সূক্ষ্ম তফাত আছে। সাধারণ অর্থে মুসলিম তো সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের বার্তাকে বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ যিনি কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করেন— আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল। অপরদিকে একজন মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রকৃত অর্থে সুদৃঢ়ভাবে ইসলামের উপর ঈমান রাখেন এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করেন। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, যিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত বলে ঘোষণা-প্রদান করেন তিনি একজন মুসলিম। আর আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেওয়ার পরে ব্যক্তির উপর যে-সকল দায়দায়িত্ব অর্পিত হয় সেগুলো যিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে পূরণ করেন তিনি হলেন মুমিন। একজন মুমিনের ঈমান হয় পরিপূর্ণ এবং অবিচল। তিনি কোনো সন্দেহ-সংশয়ে ভোগেন না, বরং ইসলামের জন্য সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকেন। আল্লাহর পথে নিজের জান এবং মাল কুরবান করে থাকেন।

একজন ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম ঘোষণা দিয়ে ইসলামের স্তম্ভসমূহের অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু হয়তো-বা তার অন্তরে খুব সামান্যই ঈমান রয়েছে কিংবা মোটেও ঈমান নেই। হতে পারে সে একজন মুনাফিক যে মুসলিম হওয়ার ভান করে যাচ্ছে। বর্তমান দুনিয়াতে প্রায় পৌনে দুই শ কোটি মানুষ নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে। আমাদের মধ্যে কতজন সত্যিকার অর্থে মুসলিম? কয়জন নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে

[৯] মুসলিম : ৮

আত্মসমর্পণ করেছেন? কয়জন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পালন করেন? আমাদের মধ্যে কয়জন মুমিন? কয়জন সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী—যারা বিশুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাসের সাথে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের সকল আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর উত্তর হলো—খুব বেশি মানুষ নয়। এ কারণে সন্তানের আগে পিতা-মাতাকে ঈমানি শিক্ষা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ঈমানের অর্থ কী, কীভাবে সেটা পরিচর্যা করতে হয় ইত্যাদি তাদেরকে আগে শেখাতে হবে। এরপর কীভাবে সন্তানদের মধ্যে ঈমানের বিকাশ ঘটানো যায় সে আলোচনা আসবে।

পারিভাষিক অর্থে দেখা যায়, ঈমান হলো ইসলামের থেকে ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। বস্তুত ইসলামের স্তম্ভসমূহকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ঈমানের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র হলো মানুষের অন্তর। সেটাই সকল বিশ্বাসকে ধারণ করে। ঈমানের মধ্যে মুখের কথা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোচ্চ শাখা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই ঘোষণা প্রদান করা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা হতে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া।'[১০] সালাত, যাকাত, সিয়াম এবং হাজ্জ ইত্যাদি ঈমানের উপাদান, এভাবে অন্যান্য সদগুণসমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, যেমন- হায়া (লজ্জা), সততা, ইখলাস ইত্যাদি।

সুতরাং, ইসলাম (আত্মসমর্পণ) ঈমানের একটি অংশ। ইবনু কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, 'ঈমান নিম্নের উপাদানসমূহের মাধ্যমে গঠিত :

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যা শিক্ষা দিয়েছেন সেই বিষয়ে ইলম থাকা।

২. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনীত সকল বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা।

৩. তাঁর আনীত সকল বিষয়ে মৌখিক স্বীকৃতির ঘোষণা প্রদান করা।

৪. ভক্তি ও বিনয়-সহকারে তাঁর আনীত সকল বিষয়ে আত্মসমর্পণ করা এবং

৫. গোপনে ও প্রকাশ্যে রাসূল (ﷺ)-এর আনীত বিষয় অনুসারে আমল করা, সেগুলো কায়েম করা এবং বাকি মানুষদেরকে সেদিকে আহ্বান করা।'[১১]

অনেক উলামায়ে কেরাম ঈমানের তিনটি জরুরি উপাদান উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো :

১. অন্তরে বিশ্বাস,

২. মুখে স্বীকৃতি ও ঘোষণা-প্রদান, এবং

৩. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা।[১২]

[১০] বুখারি : ০৯; মুসলিম : ৩৫।
[১১] ইবনু কায়্যিম, আল-ফাওয়াইদ, পৃ : ১০৭।
[১২] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p.86

অন্তরে বিশ্বাস

মানুষের অন্তর হলো ঈমানের কেন্দ্র এবং ভিত্তি। যদি অন্তর সুস্থ এবং সঠিক থাকে তা হলে বাকি সবকিছু ঠিক থাকবে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

> 'জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো কলব (অন্তর)।'[১৩]

এ বিষয়টিকে উলামায়ে কেরাম বলেছেন 'স্টেটমেন্ট অব দ্য হার্ট' বা অন্তরের স্বীকৃতি।

স্বীকৃতি-প্রদান, সত্যায়ন করা এবং ইলম অর্জন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিষয়কে বলা হয় 'অন্তরের আমল'—এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া, নফল আমল এবং কবুলিয়াতের আশা। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর উপর আশা রাখা। ঈমানের এ-সকল জরুরি শর্ত ব্যতীত একজন ব্যক্তি নিজেকে সত্যিকার অর্থে মুমিন দাবি করতে পারেন না। নিছক ঈমানের ঘোষণা প্রদান করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখা পরিপূর্ণ ঈমান অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়।[১৪]

ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো অন্তরে বিশ্বাস করা, কেননা এই ভিত্তিটি অন্যান্য সকল ভিত্তির উপর প্রভাব বিস্তারকারী। প্রকৃত ঈমান অর্জন করতে, বিকাশ ঘটাতে ও সেটাকে সুরক্ষিত রাখতে এই জরুরি উপাদানসমূহের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ প্রদান করা আবশ্যক। একজন প্রকৃত মুমিন অবশ্যই নিজের অন্তরে অনুভব করবেন যে তিনি সত্যকে ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন এবং মিথ্যা ও কুফরকে ঘৃণা করেন। তিনি অবশ্যই আল্লাহকে ভালবাসবেন এবং এককভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করবেন—আর একমাত্র তাঁকেই ভয় করবেন।[১৫]

মুখে স্বীকৃতি প্রদান

ঈমানের দ্বিতীয় উপাদান হলো মুখে ঘোষণা দেওয়া। এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি নিজের ঈমানের প্রতি সত্যবাদী হওয়ার সাক্ষ্যপ্রদান করবেন। সেই সাক্ষ্য হলো— 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ হলেন আল্লাহর রাসূল। এই ঘোষণার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে এবং এই ঘোষণা দৈনিক পাঁচবার আযানের সময় ঘোষিত হয়। এই বক্তব্য নিছক কিছু কথার সমষ্টি নয়, বরং এটি বিশুদ্ধ নিয়ত-

[১৩] বুখারি : ৫২; মুসলিম ১৫৯৯।
[১৪] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p. 87
[১৫] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p. 89

সহকারে সকল বাধ্যবাধকতা ও প্রয়োজনীয় বিষয় পালনের উদ্দেশ্যে দ্বীন ইসলামের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ঘোষণা ও স্বীকৃতির সাক্ষ্য।

একজন ব্যক্তি যদি অন্তরে বিশ্বাস করেন কিন্তু কখনোই মুখে এই কালেমার সাক্ষ্য পাঠ করেন না, অথচ তিনি পাঠ করতে সক্ষম—তা হলে তাকে ঈমানদার বলে বিবেচনা করা হয় না। দুনিয়া কিংবা আখিরাতে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করা হয় না। মুখে ঈমানের স্বীকৃতি প্রদান করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এ কারণে যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়ার পরেও এই কালেমার সাক্ষ্য প্রদান করেন না তাকে অমুসলিম বা কাফির সাব্যস্ত করা হয়। তবে যারা নিজেদের প্রাণনাশের শঙ্কায় ভীত হয়ে এবং জোর-জবরদস্তির শিকার হয়ে চুপ থাকতে বাধ্য হন তারা এই ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নন, তাদের অবস্থা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত।

ঈমানের ঘোষণা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ইখলাস থাকা জরুরি। আরও থাকতে হবে আল্লাহর উপর বিশুদ্ধ বিশ্বাস, সকল প্রকার শিরক বর্জন করা এবং ইসলামের বিধানসমূহের বাস্তবায়ন করা। মূলত ঈমানের ঘোষণায় পরিপূর্ণ এবং সত্যবাদী হওয়ার জন্য অবশ্যই অন্তরে বিশ্বাস থাকতে হবে। যারা মুনাফিক তারা মুখে ঘোষণা প্রদান করে এবং মুসলিম হওয়ার ভান করে কিন্তু তাদের অন্তরে কোনো বিশ্বাস নেই এবং অন্তরের আমলসমূহ সেখান অনুপস্থিত।[১৬]

আমলে বাস্তবায়ন

এটি একটি সহজাত প্রত্যাশিত বিষয়। অন্তরে ঈমানের মাত্রা অনুসারে একজন ব্যক্তির আচার-আচরণ ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হবে। যে অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ (আল্লাহর উপরে ভয়, আশা ও ভরসা বিদ্যমান) সে তার নিজের দেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আনুগত্য অর্জনে ও নিষেধকৃত বিষয় বর্জনে পরিচালিত করবে। এমনকি সন্দেহজনক কাজ থেকেও বেঁচে থাকবে। অন্তরে সুদৃঢ় ঈমান রয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে না—এটা চিন্তাও করা যায় না। সুতরাং আমল হলো ঈমানের একটি মৌলিক উপাদান। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আরেকটি বিষয় হলো আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর অবাধ্যতার মাধ্যমে ঈমান হ্রাস পায়।[১৭]

ইহসান এর অর্থ

ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান-সম্পর্কিত হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'হে মুহাম্মাদ! ইহসান কী? তিনি বলেন : তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি তাকে না দেখো তবে নিশ্চয়

[১৬] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, pp. 90-91
[১৭] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p. 91

তিনি তোমাকে দেখছেন।'

ইহসান হলো ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায় যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। এর অর্থ কোনো কিছুকে সর্বোত্তম উপায়ে সম্পাদিত করা। পরিপূর্ণতা এবং উৎকর্ষতা অর্জন করা। ইসলামি শরীয়ত অনুসারে এর অর্থ উত্তমরূপে ইবাদাত ও আমল সম্পাদন করা যেভাবে আল্লাহ করতে আদেশ করেছেন। ইহসানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্যকে সর্বোত্তম উপায়ে পরিপূর্ণ করা। ইহসানের নির্যাস হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা—এটি একজন মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।

সাধারণ অর্থে অন্য মানুষের সাথে উত্তম আখলাক, সুন্দর ব্যবহার করা, তাদের প্রতি সদয় আচরণ করাও এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বীন ইসলামের ক্ষেত্রে, অন্যের প্রতি সকল সদাচরণ ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তির মধ্যে ইহসান রয়েছে তিনি অন্যের ক্ষতি না করে উপকার করার চেষ্টা করেন, নিজের সম্পদ, পদমর্যাদা এবং শারীরিক সক্ষমতার মাধ্যমে তিনি মানুষের প্রতি উপকার এবং সহায়তা প্রদান করেন।[১৮]

আলোচ্য হাদীস অনুসারে ইহসানের মূল অনুপ্রেরণা হলো এই অনুভূতি যে, আল্লাহ সদাসর্বদা একজন বান্দার আমলকে পর্যবেক্ষণ করছেন। যে ব্যক্তি সর্বদা এই অনুভূতির প্রতি সচেতন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকে এবং অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকে। এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি এবং সম্ভ্রম-শ্রদ্ধা অনুভব করে। মুহসিন ব্যক্তির সকল আমলের নিয়ত হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এর মাধ্যমে অন্তরে বিশুদ্ধতা এবং ইখলাস অর্জিত হয়। যেহেতু নিয়ত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে থাকে, সেহেতু ব্যক্তি সবকিছু সর্বোত্তম উপায়ে সম্পাদনের চেষ্টা করে। ফলাফল হিসেবে সেই ব্যক্তি নিজের আত্মসমর্পণকৃত অবস্থার উৎকর্ষতা অর্জন করে। আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকে এবং অন্যান্য মানুষের সাথেও পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।[১৯]

সন্তান প্রতিপালনের সাথে ঈমান, আকীদা, ইহসানের সম্পর্ক কী?

আলোচ্য বিষয়ের সাথে আমাদের কোর্সের সম্পর্ক হলো, পিতা-মাতার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সন্তানকে মুসলিম হিসেবে বড় করা নয়, বরং তাদের অন্তরে সুদৃঢ় আকীদা ও ঈমানের পরিচর্যা করা। যদি কোনো মুসলিম পরিবার কেবল শিশুদের বাহ্যিক ও ব্যবহারিক দ্বীনি বিষয়াদির প্রতি মনোযোগ প্রদান করে, কিন্তু আকীদার প্রতি উদাসীন থাকে—তবে সেই প্রচেষ্টার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর দৃষ্টান্ত একটি দুর্বল কাঠামোর উপরে উঁচু ভবন নির্মাণের অনুরূপ। সেই ভবন ধ্বসে পড়বে। কেবল দ্বীনের ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলে শিশুরা শিখবে কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, সিয়াম পালন করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো পালন করার প্রতি তাদের অন্তরে কোনো আন্তরিকতা সৃষ্টি

[১৮] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, pp.94-95
[১৯] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p. 198

হবে না। তারা হয়তো নিজের পরিবার, পিতা-মাতা বা মুসলিম বন্ধুদের খুশি করার জন্য সেগুলো পালন করবে, কিন্তু সেই আমল দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

মুসলিম হওয়ার প্রকৃত অর্থ প্রথমে অনুধাবন করা জরুরি। কীভাবে একজন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে এবং কীভাবে ইহসানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তা অনুধাবন করা জরুরি। শিশুর জন্ম থেকেই তার অন্তরে ঈমানের চাষাবাদ করার কাজ পিতা-মাতাকে শুরু করতে হবে। কীভাবে ইখলাসের সাথে অন্তরে বিশ্বাস এবং বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করতে হয় তা সন্তানকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। শিশুদের শেখাতে হবে কীভাবে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হয়। কীভাবে ভালোবাসা এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হয়। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা যেন অন্য যে-কোনো ব্যক্তি বা দুনিয়ার যে-কোনো বিষয়ের থেকে অধিক হয়। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

'... কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়।' (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৫)

একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন, 'কিয়ামাত কখন হবে? রাসূল (ﷺ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই দিনের জন্যে তুমি কি প্রস্তুতি-গ্রহণ করেছ? লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সঙ্গেই থাকবে।'[২০]

শিশুদের অন্তরে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে হবে এবং কুফর ও নিফাকের (দ্বিমুখী আচরণ, মুনাফেকির) প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়—

(১) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়

(২) যে একমাত্র আল্লাহরই জন্য কোনো বান্দাকে মুহব্বত করে এবং

(৩) আল্লাহ তাআলা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে।'[২১]

তাদের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য-লাভ ও পুরস্কারের আশা থাকতে হবে এবং শাস্তি ও অসন্তুষ্টির ভয় রাখতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে পিতা-মাতা সন্তানকে সত্যিকারের মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন, যারা ভবিষ্যতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের বার্তা বহন করবে। একবার ভেবে দেখুন, যদি এই পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে এক

[২০] Zarabozo, He Came to Teach Your Religion, p.198-199
[২১] বুখারি : ১৬

শ কোটি মুমিন থাকত তা হলে পৃথিবীর চেহারা কতটা বদলে যেত!

এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিন, এই ফর্মুলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'বিল্ডিং ব্লক' হলো আকীদা যা ঈমানের ভিত্তি। ঈমান গড়ে ওঠে আল্লাহর বিষয়ে জ্ঞান এবং একত্ববাদের উপর, তাঁর নাম ও গুণাবলীর উপর, তাঁর শক্তি এবং মহিমা, ক্ষমা এবং রহমতের উপর, তাঁর ইচ্ছা এবং তাকদীরের বিধান ও নবি রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসের উপর। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হতে সঠিক এবং সুদৃঢ় আকীদার গুরুত্বের শেষ নেই, কেননা বিশ্বাস থেকেই কাজের সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামদের ইসলামের ব্যবহারিক বিষয় শেখানোর আগে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে আকীদা শিখিয়েছেন। ঈমানকে সুদৃঢ় করা এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়া নিশ্চিত করার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়েছে। যদি পিতা-মাতা সন্তানদের কেবলমাত্র বিশুদ্ধ আকীদার শিক্ষা প্রদান করে এবং বাহ্যিক আমলের কিছুই না শেখায়, তবুও সেই সন্তান জান্নাতে যাওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হবে তাদের চেয়ে—যারা অনেক সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, দান খয়রাত করে, কিন্তু কবর-মাজার পূজা তথা শিরক করে।

একজন ব্যক্তির মধ্যে সত্য-মিথ্যা পৃথক করার যোগ্যতা (বিবেক) বিকাশের জন্য এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি সঠিক বিশ্বাস থাকা জরুরি। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং সত্য-মিথ্যা পৃথক করার ক্ষমতা কেমন সেই ভিত্তিতেই একজন ব্যক্তি সকল পরিস্থিতিতে বৈধ ও সঠিক কাজটা করতে পারে। সে স্বেচ্ছায় উত্তম বিষয় নির্বাচন করে, জোরপূর্বক তাকে বাধ্য করতে হয় না।

এ কারণে যে-শিশুর মধ্যে ঈমান এবং তাকওয়া বিকশিত হয়েছে তাকে প্রতিপালন করা অনেক সহজ। যে শিশু স্বেচ্ছায় আল্লাহর প্রতি ভয় এবং ভালোবাসার ভিত্তিতে ভালো-মন্দ নির্বাচন করতে পারে তাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে হয় না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কাজের পুরস্কারের দিকে মনোযোগ প্রদান করা হয়, ভালো আচরণের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ আচরণের জন্য শাস্তি প্রদানকে উৎসাহিত করা হয়। এই টেকনিকগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে, কিন্তু এগুলোকে সন্তান প্রতিপালনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। যদি পিতা-মাতা সন্তানের অভ্যন্তরীণ (ঈমানি) শক্তি বিকাশে সহায়তা প্রদান করে, তবে এই ধরনের টেকনিকের খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় মোটেও প্রয়োজন হয় না। ঈমান বিকাশের দিকে প্রধান মনোযোগ দিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে সন্তুষ্টি এবং পুরস্কার অর্জনের দিকে, মানুষের মূল্যায়নের দিকে নয়। শিশুর অন্তরে গভীরভাবে এ বাস্তবতা অনুধাবন করাতে হবে যে মানুষের প্রশংসা, পুরস্কার বা যে-কোনো দুনিয়াবি বস্তুগত কিংবা সামাজিক পুরস্কারের থেকেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন অনেক অনেক উত্তম।

এই অধ্যায়ের সর্বশেষ নিবেদন—পিতা-মাতা সন্তানের অন্তরে ঈমানের পরিচর্যা ও

বিকাশ ঘটাবেন যেন তারা সফলতা অর্জন করতে পারে। শুধুমাত্র দুনিয়াতে নয়, বরং আখিরাতের সফলতা হলো প্রধান সফলতা। এ বিষয়টি শিশুদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে দিতে হবে। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতা সম্পদ বা ক্ষমতার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় না, বরং সফলতা পরিমাপ করা হয় আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য এবং আখিরাতের জীবনে জান্নাত অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেছেন,

لَـٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّـهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

> ‘কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণা। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সৎকর্মশীলদের জন্যে একান্তই উত্তম।’ (সূরা আ ল ইমরান, ৩ : ১৯৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ اللَّـهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

> ‘আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহা সফলতা।’ (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১১৯)

নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন।

অধ্যায় দুই

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বশীলতা অনুধাবন

মুসলিম হিসেবে সন্তান প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব অনুধাবন করা খুব জরুরি। শিশুদের আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো ইত্যাদি বাধ্যবাধকতা বোঝা খুবই জরুরি। আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ﴿٦﴾

> 'মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারপরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ-হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ।' (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৬)

এই আয়াতের অর্থ এবং প্রয়োগ কী? এখানে সাধারণভাবে প্রত্যেক মুমিনকে সাবধান করা হয়েছে যেন সে নিজেকে রক্ষা করে, নিজের পরিবার এবং সন্তানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে—যে আগুন ইতোমধ্যেই প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় আছে এবং যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। এটি একটি চূড়ান্ত সতর্কবার্তা যা অবশ্যই সিরিয়াসলি গ্রহণ করা উচিত। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই প্রধান ফোকাস হওয়া উচিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

> ‘হে কাফির-সম্প্রদায়! তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে। মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবাহ করো—আন্তরিক তাওবাহ। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ সেদিন নবি এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না...’ (সূরা তাহরীম, ৬৬ : ৭-৮)

বিচার-দিবসে কাফিরদের কুফরের পক্ষে কোনো অজুহাত চলবে না। এই আয়াতে আল্লাহ মুমিনদেরকে ইখলাসের সাথে তাওবাহ করতে বলেছেন যেন তিনি তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন যা ইতোমধ্যেই সুসজ্জিত অবস্থায় আছে। একজন ব্যক্তির চিরস্থায়ী ঠিকানা নির্ধারিত হবে দুনিয়াতে তার বিশ্বাস ও কাজকর্মের ভিত্তিতে। পিতা-মাতা ও সন্তানদের কাজের চিরস্থায়ী ফলাফল এই বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রিয় পাঠক! জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে কোনটি উত্তম? কোন ঠিকানার জন্য আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি?

দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

> ‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম (নেতা) একজন দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ (স্বামী) তার পরিবারবর্গের দায়িত্বশীল, তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীল, তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হবে। খাদেম তার মুনিবের ধন-সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।’[২২]

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গুরুত্বারোপ করে জানিয়েছেন সন্তান প্রতিপালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব যা আন্তরিকভাবে ও সিরিয়াসলি পালন করতে হয়। পরকালের জীবনের জন্য শিশুদের প্রস্তুত করার প্রতি মনোযোগী হয়ে দুনিয়াতে পিতা-মাতা নিজের সন্তানের পরিচর্যা করেন, যত্ন নেন এবং তাদের সুরক্ষিত রাখেন। দায়িত্বশীলতার সাথে আসে জবাবদিহিতা, যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতগুলোতে এসেছে। আল্লাহ প্রত্যেক পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের দায়িত্বের হিসাব গ্রহণ করবেন—বিচার-দিবসে তাদের সেই আমলনামা প্রদান করা হবে। ফলে সন্তান প্রতিপালন করার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দরজা

[২২] বুখারি : ৮৯৩; মুসলিম : ১৮২৯

উন্মুক্ত হতে পারে অথবা ব্যর্থ হলে জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত হতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন নিছক একটি দায়িত্ব নয়, বরং এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি। পিতা-মাতার হাতে পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে ওঠে যারা ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে হয়তো সফলতা অর্জন করবে অথবা ব্যর্থতার মুখ দেখবে। সুতরাং মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ ও সফলতা নির্ভর করে পিতা-মাতার সফলতার উপর। একজন শিশু অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে নিজের পিতা-মাতার মাধ্যমে বেশি প্রভাবিত হয়। সন্তানকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে পুরো সমাজকে প্রভাবিত করা যায়। পরিবার হলো সমাজ গঠনের 'বিল্ডিং ব্লক' বা ভিত্তি। আর ভিত্তি শক্তিশালী হলে পুরো সমাজ শক্তিশালী হবে। ফলে বাধ্যতামূলকভাবে পিতা-মাতাকে নিজের দায়িত্ব বুঝতে হবে। নিজেদের ভূমিকার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে হবে এবং সেই ভূমিকার সাথে জড়িত সকল দায়িত্বকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা

সন্তানসন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা এবং এই ব্যাপারে তারা বিচার-দিবসে জিজ্ঞাসিত হবেন, এই মৌলিক বিষয়টি সকল পিতা-মাতাকে অবশ্যই বুঝতে হবে। এর গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। আল্লাহ বলেছেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

'এবং জেনে রেখো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। বস্তুত আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান।' (সূরা আনফাল, ৮ : ২৮)

অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

'তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।' (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১৫)

এই আয়াতগুলোতে যে-আরবি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো 'ফিতনা' যার অনুবাদ 'পরীক্ষা', 'গুণগত মান যাচাই করা'। দুনিয়া নানাবিধ পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। এটা আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ যে, তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা, বিপদআপদ ও অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদেরকে যাচাই করবেন। সন্তান ও পরিবার সেই মান যাচাইয়ের একটি অংশ। এভাবে আল্লাহ মুমিনদেরকে কাফিরদের থেকে পৃথক করেন এবং সত্যবাদী আন্তরিক ব্যক্তিদেরকে মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের থেকে পৃথক করেন। আল্লাহ বলেছেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّـهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

'লোকেরা কি মনে করে রেখেছে—আমরা ঈমান এনেছি—কেবলমাত্র এ কথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি আল্লাহ অবশ্যই দেখবেন কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।' (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২-৩)

আল্লাহ মানুষকে বিপদআপদ এবং নিয়ামাত উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন এবং জেনে নেন কারা ধৈর্যশীল, শোকর আদায়কারী, কারা অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য। তিনি যাচাই করে নেন কারা তাঁর বাধ্যগত বান্দা হতে চায় এবং কারা অবাধ্যগত ও উদ্ধত। এরপর বিচার-দিবসে ফলাফল অনুসারে তিনি কাউকে শাস্তি এবং কাউকে পুরস্কার প্রদান করবেন। আল্লাহ নানাভাবে বিপদ আপদের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করেন। তিনি তাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, ফল-ফসলের ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি, জীবন এবং বাসগৃহের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। তিনি কাউকে সন্তান দিয়ে কিংবা কাউকে সন্তান না দিয়েও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। এবং যখনই কোন বিপদ আসে তারা বলে, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে। তারা সে-সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াত-প্রাপ্ত।' (সূরা বাকারাহ, ২:১৫৫-১৫৭)

পরীক্ষা এবং বিপদআপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য রহমত, যেন এগুলোর কারণে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাওবাহ করে এবং আল্লাহর নিষেধকৃত বিষয়কে পরিত্যাগ করে—যেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন। তিনি আমাদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন যেন আমাদের অন্তরগুলো পরিশুদ্ধ হতে পারে এবং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবাহ করে আল্লাহর দিকে আমরা ফিরে আসতে পারি। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾